ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1755-1761
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.398

খল চরিত্রের স্বরূপ ও ক্ষমতার রাজনীতি: সিংহাসনের ক্ষয়রোগ

সন্দীপ ঘোষ, *গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 30.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Mohit Chattopadhyay (1934–2012) is a legendary name in Bengali drama. This essay explores his famous play Singhasaner Khayrog (1967), focusing on how he portrays 'villainy' or the 'antagonist' in a unique way. Unlike traditional plays where a villain is just a bad person, Mohit Chattopadhyay shows that in this play, the "villain" is actually the corrupt system and the hunger for power.

Set against the backdrop of the political unrest in the 1960s and 70s, the play tells the story of a dying monarchy where a Queen is the face of the throne, but the real power is held by the cruel 'Durgashashak'. The essay analyzes how the ruling class—including the Scientist, the 'Barta Adhikarta', and the 'Palli Sebak'—uses lies, fear, and fake threats to control the common people.

'Khayrog' mentioned in the title refers to the moral rot that happens when people become obsessed with staying in power. By using symbols and deep psychological insights, Mohit Chattopadhyay shows that the real monsters are not outside, but within the greedy rulers who exploit the poor. This essay concludes that the play is still relevant today as a powerful protest against any form of dictatorship and social injustice.

Keywords: Singhasaner Khayrog, The 1960s-70s, Lust for Power, Antagonist, Mass Awakening, Self-interest, Durgosashak, The Queen.

বাংলা নাট্যসাহিত্যে মোহিত চট্টোপাধ্যায় এক স্মরণীয় নাম। তিনি ১ জুন ১৯৩৪ সালে বাংলাদেশের বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার বছরই মাত্র তের বছর বয়সে তিনি পরিবারসহ বাংলাদেশ ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন। মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর কলেজের প্রভাষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় এবং পরে তিনি সিটি কলেজে বাংলা রিডার হিসেবে যোগ দেন। সিটি কলেজে পড়াকালীন তাঁর পরিচয় হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে, যাদের মধ্যে অন্যতম হলেন- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। তারপরেই শুরু হয় তাঁর সাহিত্যচর্চা। মোহিত চট্টোপাধ্যায় শুরুতে শুধুমাত্র কবিতা লিখতেন। পরে কবিতা লেখা বন্ধ করে নাটক লিখতে শুরু করেন। তিনি যে সময়ে নাটক লিখছেন সেই সময়েই লিখছেন বাদল সরকার, শম্ভু মিত্র, মনোজ মিত্র, উৎপল দত্তের মত বিখ্যাত সাহিত্যিকেরা। তাই তার পথটা মোটেই সহজ ছিল না। তারপরেও অল্প সময়ের মধ্যেই অভিনব বিষয়বস্তু, অন্য স্বাদের চরিত্র, গঠন

বিন্যাস, সংলাপের মাধ্যমে সমকালের একজন অন্যতম এবং ব্যতিক্রমী নাট্যকার হিসাবে মর্যাদা পান। তিনি খুব সহজ সরল ভাবে যুগের সমস্যাগুলিকে অভিনব কায়দায় তুলে ধরতেন। আসলে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ও স্বাধীনতার সমকালের হিংসা, দলাদলি, মারামারি, মিছিল এসব যেমন প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন। ঠিক তেমনই তিনি দেখেছেন সাধারণ মানুষের করুণ অবস্থাও। এরকম একটা সময়ে তিনি নাটকের প্রভাব নিয়ে বলেছেন – “নাটকের কাছে দুঃসময়ে মানুষ পাশে এসে দাঁড়ায়। নাটকের মধ্যে একটা দুর্জয় প্রাণশক্তি আছে।... সেখানে কোন বাধাই বাধা নয়। নাটক সংকটকে বিশ্লেষণ করে এবং তার গ্রাস থেকে উদ্ধারের সংকেত দেয়। নাটক মনে করায় মানুষ কীভাবে মিলেমিশে বলবান হয়ে উঠতে পারে, নাটক শিখিয়ে দেয় বিষাদ সরিয়ে আমরা কীভাবে হেসে উঠতে পারি, নাটক ঘোষণা করে অন্যায় শেষ পর্যন্ত পরাজিত হতে বাধ্য।”[১]

তাই তাঁর কলমে অন্যায়, অত্যাচার, হতাশা, কান্না, প্রতিবাদ সবকিছু উঠে এসেছে। যা তাঁকে সমকালীন অন্য লেখকদের থেকে আলাদা করে। তাই শুরুতে কবিতা লিখলেও সাহিত্যের জগতে নাট্যকার হিসেবেই তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তবে একথাও ঠিক যে সমকালের বাকি নাট্যকারেরা যেমন ভাবে আলোকিত হয়েছেন, মোহিত চট্টোপাধ্যায় ততটা হন নি। তাঁর নাটকের সংখ্যা প্রায় শতাধিক এবং নাটকগুলি বিভিন্ন শ্রেণির। তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, প্রতিবাদী, একাঙ্ক, জীবনী সব ধরণের নাটক রচনা করেছেন। সর্বোপরি নাটকগুলি পাঠ করলে আমরা নাট্যকারের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই।

আমরা জানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ভারতে খুব বেশি না পড়লেও, ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ভারতে পড়েছিল। সামাজিক, পারিবারিক বিপর্যয়ের সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি মানুষের জীবনকে তছনছ করে দিয়েছিল। তারপরে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন ও দেশভাগ। ফলে মানুষের অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। মানুষ তার কাঙ্খিত স্বাধীনতা পেলেও, স্বাধীনতা পরবর্তী যে সুখ-শান্তি পাবার কথা তা পায়নি। তাদের আশা-প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। কারণ সরকার যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল- অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি, অন্ন-বস্ত্রের জোগান, সামাজিক বৈষম্য তুলে দেওয়া, শ্রেণি শোষণ তুলে দেওয়া, সকলের জীবিকার ব্যবস্থা করা কোন কিছুই পূরণ করতে পারে নি। বরং উল্টো জিনিস দেখা গেল। সমাজে সংঘাত ও বৈষম্য আরও চরম আকার নিল। বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মালিক শ্রেণি আরও অর্থবান হয়ে উঠল। অন্যদিকে নিম্নশ্রেণির সাধারণ মানুষের অবস্থা আরও খারাপ হল। তার ফলস্বরূপ এতদিন ধরে দারিদ্র ও হতাশায় ভুক্তভোগী একশ্রেণির শ্রমজীবী মানুষ প্রতিবাদী হয়ে উঠল। মালিক শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস দেখাল। কোন অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ আর সহ্য করল না তারা। শাসন ব্যাবস্থার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল তারা। এই সবকিছুই মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত বিভিন্ন নাটকে উঠে এল। শাষক শ্রেণির মুখোশ টেনে খুলে দিলেন তিনি তাঁর নাটকে। এই পটভূমির উপরেই লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক ‘সিংহাসনের ক্ষয়রোগ’। যেখানে তিনি শোষিত, অত্যাচারিত, বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে শাসক শ্রেণির অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন।

বাংলা নাটকে খল চরিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ‘সিংহাসনের ক্ষয়রোগ’ নাটকটিকে বেছে নিয়েছি। নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘নক্ষত্র’ পত্রিকায়, ১৯৬৭ সালে। তিনটি দৃশ্যে নাট্যকার তৎকালীন শাসনব্যবস্থার নানান সমস্যার কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন নাটক কেবল বিনোদন নয়, বরং তা সমাজের গভীরে থাকা পচনকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার মাধ্যম। তবে তিনি তা সরাসরি না করে, করতেন প্রতীকের মোড়কে।

যে কোনো সার্থক নাটকের প্রাণভোমরা হলো তার চরিত্রায়ন। বিশেষ করে 'খল চরিত্র' বা 'Antagonist'-এর উপস্থিতি নাটকের দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তোলে। তবে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের এই নাটকে 'খল' স্বভাব কোনো একক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এখানে খল চরিত্রগুলো কেবল ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা দ্বারা চালিত নয়, বরং তারা এক একটি ব্যবস্থার প্রতিনিধি। এই নাটকে শাসক শ্রেণির দম্ভ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং সুযোগসন্ধানী রাজনীতির যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তার প্রতিটি স্তরে খল চরিত্রের বিভিন্ন মাত্রা পরিলক্ষিত হয়।

প্রথাগত নাটকে খল চরিত্রকে আমরা যেভাবে কেবল 'ভিলেন' হিসেবে দেখি, মোহিত চট্টোপাধ্যায় এখানে সেই ধারণাকে ভেঙে দিয়েছেন। খল চরিত্র বলতে আমরা বুঝি যার মধ্যে ব্যক্তিগত ঘৃণা, ঈর্ষা বা কোনো খারাপ উদ্দেশ্য থাকবে। কিন্তু এই নাটকে খল চরিত্রের ধারণাটি অনেক বেশি গভীর এবং মনস্তাত্ত্বিক। এখানে খল কোনো একক ব্যক্তির স্বভাব নয়, তা একটা 'সিস্টেমে'র ফসল। এখানে ক্ষমতার মোহগ্রস্ত মানুষগুলো নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। খলনায়ক এখানে কোনো নির্দিষ্ট অবয়ব নয়, বরং সিংহাসন টিকিয়ে রাখার অন্তহীন পিপাসা।

বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের উত্তাল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায় যখন 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' রচনা করেন, তখন বাংলা নাটকের ধারা এক আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। চারপাশের পরিবেশ তখন অত্যন্ত প্রতিকূল। মানুষের সাধারণ জীবনের ছন্দ ভেঙ্গে পড়েছে। মানুষের প্রতি মানুষের হিংসা, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার তখন তুঙ্গে। তখনই এই প্রতিবাদী নাটকে সূক্ষ্ম কৌশলের মাধ্যমে প্রতিবাদ ভাবনার বীজ রোপণ করলেন তিনি। তাই এই নাটকটি কেবল একটি রাজনৈতিক রূপক নয়, বরং এটি ক্ষমতার অমোঘ লালসা এবং তার ফলে সৃষ্ট চারিত্রিক বিচ্যুতির এক নিপুণ ব্যবচ্ছেদ। নাটকের নামটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে এর মূল উপজীব্য— ক্ষমতা বা 'সিংহাসন' যখন মানুষকে গ্রাস করে, তখন তা এক মরণব্যাধি বা 'ক্ষয়রোগে'র মতো তার বিবেক ও মনুষ্যত্বকে ক্ষয় করতে থাকে।

নাটকে একটি রাজ্যের কথা এসেছে, যে রাজ্যে রাজা মৃত, তাই রানিই শাসক। নাটকটিতে মোট নয়টি চরিত্র আছে। যাদের মধ্যে খল স্বভাবের চরিত্র হল - রানি, দুর্গশাসক, বৈজ্ঞানিক, পল্লীসেবক, বার্তা-অধিকর্তা প্রমুখেরা। কিন্তু এদের মধ্যে প্রধান খল চরিত্র হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি দুর্গশাসককে। লক্ষ করলে দেখা যায় দুর্গশাসকের প্রভাবেই নাটকের অন্যান্য চরিত্র খারাপ কাজে লিপ্ত হয়েছে। এবং নাটকে তারাও খল চরিত্র হিসেবে উপস্থিত হয়েছে।

শাসন ক্ষমতার উর্ধে রানি থাকলেও সকলকে আদেশ করে দুর্গশাসক তা নাটকের শুরুতেই জীবনলালের কথায় স্পষ্ট – "দুর্গশাসক আমাকে সমাহিত জনতা বলতেই শিখিয়েছে।"[২]

অর্থাৎ জীবনলাল যে ঘোষণা করছে তার বুলি তাকে শিখিয়ে দিয়েছে দুর্গশাসক, রানি নয়। নাটকের খল চরিত্র যে দুর্গশাসক এবং সে অত্যাচারী তা শুরুতেই স্পষ্ট হয়ে যায় চিত্রলেখার কথায়– "ঐ শোন, সেই শকুনটা আসছে, পালাই। দুর্গশাসকের সামনে যেন আবার কাব্য করতে বোসনা। হাতের চাবুকটা ছাড়া ও আর কিছু বোঝে না।"[৩]

নাটকে যে রাজ্যের কথা বলা হয়েছে তার রাজাকে চক্রান্ত করে হত্যা করা হয়েছে। রানি এখন সে রাজ্যে সিংহাসনে উপবিষ্ঠা। তবে রানিকে সামনে রেখে জনগণকে অত্যাচার করে এবং সম্পূর্ণ শাসনকার্য চালায় দুর্গশাসক। রাজ্যের প্রশাসনিক থেকে অর্থনৈতিক সমস্ত বিভাগে ক্ষমতার অধিকারী। একথা আরও

স্পষ্ট হয়ে যায় সৈন্যাধ্যক্ষের কথায়– "যেখানে আপনি ক্ষমতাসম্পন্ন, সেখানে রাণীর জন্য আদেশের অপেক্ষা শাসনে দ্বিধা এবং আলস্য এনে দিতে পারে।"[৪]

রানি এবং রাজ্যের অন্যান্য ক্ষমতাশীল ব্যক্তি যেমন- বৈজ্ঞানিক, সৈনাধ্যক্ষ, বার্তা-অধিকর্তা, পল্লীসেবক প্রমুখদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের কাজটাও সেই করে। দুর্গের মধ্যে কে প্রবেশ করবে, কে রানির সঙ্গে দেখা করতে পারবে সেই সিদ্ধান্তও দুর্গশাসকেরই। রানি এখানে নামমাত্র শাসক। তাইতো দুর্গশাসক স্পষ্টই বলেন- "রাণীর আদেশ একটা কূটনৈতিক সৌজন্য মাত্র। ওটি দরকার।"[৫] আর এই ব্যাপারে দুর্গশাসকে প্রশ্রয় দেয় রানি নিজেই। চিত্রকর দুর্গশাসকের সঙ্গে কথা না বলে রানির সঙ্গে কথা বলতে চাইলে রানির বক্তব্য বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে– "দুর্গশাসক আমার হয়েই প্রশ্ন করেছেন।"[৬] আর এই প্রশ্রয়ের ফলেই রানিকে সামনে রেখে তার আড়ালে সর্বময় কর্তা হয়ে উঠেছে দুর্গশাসক। এই প্রশ্রয় এতটাই বেশি যে জনগণের ক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ হিসাবে সরাসরি রানিকে দায়ী করেছে দুর্গশাসক।

রাজ্যের অন্যান্য ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও সামনে রানির প্রশস্তি আওড়ালেও তারা প্রত্যেকেই একথা স্পষ্ট জানে যে, যে-কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্গশাসকের মতই প্রাধান্য পাবে। তাইতো দক্ষিণ গাঁয়ের সাঁকো মেরামত বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থের থেকে বেশি বরাদ্দ করার দাবি পল্লীসেবক দুর্গশাসকের কাছেই করেছে, রানির কাছে নয়। দুর্গশাসকের ক্ষমতা ও শঠতা সম্পর্কে বাকিরা জানে বলেই তার কূটনৈতিক চক্রান্ত রানি আসার আগে আলোচনা করার প্রস্তাবে বার্তা-অধিকর্তা যখন আশঙ্কা প্রকাশ করে- "এ রাজ্যের পুরনো রাজার যে পরিণতি ঘটেছিল, রাণীর ক্ষেত্রেও কি তার পুনরাবৃত্তি ঘটছে?"[৭] তখন দুর্গশাসকের জবাব প্রমাণ করে যে রানি শুধু হাতের পুতুল- "রাণী আসলেই মৃত, বহুকাল মৃত। আপনারা সবাই যাকে দেখেন তিনি কেবল একটি সাম্রাজ্ঞীর ছায়ামূর্তি।"[৮]

শাসকের সঙ্গে শোষিতের সবথেকে বড় লড়াই বাঁধে রাজ্যের ফুলবাগানটি নিয়ে। আসলে বিশেষ কিছু উদ্দেশ্যকে সফল করতে রাজ্যের বহুমূল্য পুষ্পোদ্যানকে নিলাম করতে চায় দুর্গশাসক। এমনকি এই ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে জীবনলালকে দিয়ে গোটা রাজ্যে ঘোষণা করিয়ে দেবার পর নিয়ম রক্ষার জন্য সেই সিদ্ধান্তের কথা রানিকে জানিয়েছেন মাত্র। তাদের অভিপ্রায় ওই ফুলবাগান তাদের মধ্যেই কেউ একজন কিনে নেবে এবং প্রাপ্ত অর্থ রানি জনসাধারণকে দান করবেন। যাতে রাজ্যবাসীর মনে হয় রানির উদ্দেশ্য সৎ। কিন্তু এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এর আড়ালে তারা এক ভয়ংকর পরিকল্পনাকে রূপ দিতে চায়। আসলে তারা যে কোন উপায়ে জনগণের প্রতিবাদকে থামাতে চায়। তাই সেই ফুলবাগান কেটে গবেষণাগার তৈরি হবে। সেখানে বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত যন্ত্র থেকে একদল উদ্ভট ও ভয়ংকর প্রাণীর আবির্ভাব ঘটবে। যারা সমগ্র অঞ্চলকে অধিকারের জন্য আক্রমণ করবে। এই ধরনের একটা খবর বার্তা-অধিকর্তা, পল্লিসেবক বিদ্রোহী জনতার মধ্যে প্রচার করবে। তাদের উদ্দেশ্য এর মাধ্যমে জনতাকে বহিঃশত্রুর ভয় দেখানো। যাতে ভয়ে তাদের বিদ্রোহ রদ হয়। এবং বহিঃশত্রুদের হাত থেকে বাঁচতে আশ্রয় নেয় রাজশক্তির। দুর্গশাসকের এই ঘৃণ্য পরিকল্পনাতে রানিও বলে উঠেছেন- "আমাদের দুর্গশাসকের মৌলিক শঠতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।"[৯]

কিন্তু তাদের এই চালাকি রাজ্যের জনগণের অজ্ঞাত নয়। ওদের প্রত্যেকের আসল রূপ জনতা জানে বলেই এই বিক্ষোভ। তারা জানে বলেই চিত্রকরকে যখন ভয়ঙ্কর, উদ্ভট প্রাণীর ছবি আঁকতে বলা হল তখন সে সভাস্থিত ওই ব্যক্তিদেরই কারো চোখ, কারো মুখ, কারো চোয়ালকে বাড়িয়ে কমিয়ে তার সঙ্গে প্রাচীন প্রাণীর অবয়ব জুড়ে ছবি এঁকেছে। এথেকে একথা স্পষ্ট যে তাদের অহঙ্কার, ক্ষমতার অপব্যবহার ও

স্বার্থপরতার লড়াই রাজ্যে প্রতিবাদ ডেকে আনবে। যার মূলে দুর্গশাসক। কিন্তু সেই কাজ সম্পর্কে অবগত হয়ে জনগণ যখন বাধা দিয়েছে তখন তাদের শায়েস্তা করতে সৈন্যাধ্যক্ষ দুর্গশাসকের স্বাধীনতা চেয়ে রানিকে বলেছে – "দুর্গশাসকের কিছু অতিরিক্ত স্বাধীনতার প্রয়োজন আছে এ ব্যাপারে।"[১০] অর্থাৎ জনগণকে থামাতে রানির আদেশের থেকে এই ব্যাপারে দুর্গশাসকের স্বাধীনতা প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে সৈন্যাধ্যক্ষের।

নাটকের শেষে যখন সমবেত জনতা তাদের এই ঘৃণ্য কৌশলকে ধরে ফেলেছে, দুর্গ আক্রমণ করেছে তখন দুর্গশাসকের স্বার্থপরতা আরও একবার স্পষ্ট রূপে দেখা গিয়েছে। দুর্গশাসক নিজ পরিকল্পনার সঙ্গী বৈজ্ঞানিক ও বার্তা-অধিকর্তাকে ক্ষিপ্ত জনতার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছে দুর্গে। পরিকল্পনা করেছে দুর্গ ছেড়ে পালানোর। তার মতে প্রাণে মরার থেকে অপমান ও পরাজয় মেনে নিয়ে সিংহাসনে ফিরে পুনরায় ক্ষমতা লাভই কাম্য। রানি তার এই ভীরুতাকে ধিক্কার জানালে দুর্গশাসক বলে- "রানির ব্যক্তিগত দম্ভের থেকেও আমাদের সিংহাসন অধিক মূল্যবান। যতদিন সিংহাসন বাঁচে, ততদিন আধিপত্যের সুযোগও বাঁচে।"[১১]

এই ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তারই তার একমাত্র কামনার বস্তু। তাই নিজের কূটকৌশল ও শঠতা দিয়ে রানিকে নিজের হাতে রাখতে চায়। সিংহাসনের যাবতীয় ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে চায়। নাটকটির শেষে গিয়ে মনে হয় রানির সঙ্গে তার এক গোপন অবৈধ সম্পর্ক আছে। কারণ সর্বসমক্ষে রানিকে 'আপনি' বললেও, আড়ালে 'তুমি' সম্বোধন করেছে। আবার সংকট সময়ে তার রানিকে নিয়ে দুর্গ ত্যাগ করতে চাওয়ার মধ্যে কোথাও কিন্তু তাদের প্রেম সম্পর্কের উজ্জ্বলতা নেই বরং সেখানে দুর্গশাসকের ক্ষমতার লোভ ও স্বার্থপরতাই ধরা পড়েছে। তাই সে বলেছে- "সিংহাসনের সঙ্গে শাসকের মিলনই সত্য- আমাকে বাদ দিয়ে সিংহাসনটা খেলনা মাত্র। রানির বিলাস আর মোহ দুর্গশাসকের সঙ্গে বহুকালের অবৈধ সম্পর্কে বাঁধা।"[১২]

আর এই শাসনকার্য চালাতেই তার প্রয়োজন হয়েছিল বার্তা-অধিকর্তা, বৈজ্ঞানিক, পল্লিসেবকদের। তাই প্রয়োজন ফুরালে তাদের ক্ষিপ্ত জনতার কবলে ছেড়ে আসতে দুর্গশাসক দুবার ভাবেনি। কিন্তু রানির প্রয়োজন তার ফুরায়নি। কারণ রানি থাকলে তবেই সিংহাসন থাকবে। আর সিংহাসন থাকলেই থাকবে ক্ষমতা। তাই আজও রানি তার পথের সঙ্গী। নাটকের শুরু থেকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব নাটকের বেশিরভাগ ঘটনাই দুর্গশাসকের অঙ্গুলি হেলনে সংঘটিত হয়েছে। তার শঠতা, পরিকল্পনা নাটকটিতে গতি সঞ্চার করেছে। তার স্বার্থপরতাই সাধারণ জনতাকে উত্তেজিত করে তুলেছে। খল চরিত্র হিসেবে এখানেই তার সার্থকতা।

'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' নাটকটিতে সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী হলেন রানি। রাজা মৃত। তিনিই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাব তিনি নিজেই চালিত হচ্ছেন দুর্গশাসকের দ্বারা। তবে দুর্গশাসকের এই শঠতা রানি জানেন না তা নয়। সব জানা সত্ত্বেও রানি তাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং পুনরায় প্রজাদেরকে বঞ্চিত করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার কাজে তাকে পরোক্ষভাবে সাহায্যও করেছেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে দুর্গশাসকের পাশাপাশি রানিও একটা অন্যতম খল চরিত্রের উদাহরণ।

সিংহাসনে উপবিষ্ট রানির যে চিত্র আমাদের মনের মধ্যে আসে তার সঙ্গে নাটকের রানির কোনো মিল আমরা পাই না। রানি বুদ্ধিমতী, তাই তিনি চিত্রলেখার মত বোকা ছাড়া কাজের লোক রাখেন না। রানি সাহসী, বুদ্ধিমতীও। কিন্তু তিনি একবারেই জনদরদি নন। তাই তো দুর্গশাসকদের নানাবিধ অত্যাচারে যখন

স্থানীয় এলাকার মানুষজনের মধ্যে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠতে শুরু করে তখন সেই বিদ্রোহ দমনের জন্য সাধারণ মানুষের বিপক্ষে যেতে রানি দুবার ভাবেন না। দুর্গশাসকরা ফুলবাগান বিনষ্ট করে সেখানে গবেষণাগার তৈরী করেছে এবং কৃত্রিম ভয়ংকর প্রাণীর আবির্ভাব ঘটিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে নিজেদের পদদলিত করে রাখতে চেয়েছে। রানিও তাদের সেই ঘৃণ্য পরিকল্পনায় যুক্ত হয়েছেন। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য চিত্রকরকে রূপের মোহে প্রলুব্ধ করে কাজ হাসিল করতেও পিছ-পা হননি তিনি। কাজ সম্পূর্ণ হলে চিত্রকর যাতে তাদের কোনো ক্ষতি না করতে পারে তাই তাকে কৌশলে দুর্গে নজরবন্দী করে রেখেছেন। তাকে নিজের বশীভূত করে শুভ উদ্দেশ্য থেকে বিমুখ করতে চেয়েছেন। এসব কাজ একজন আদর্শ রানির থেকে কূট ছলনাময়ীর রূপকে বেশি সুস্পষ্ট করে তোলে। কারণ তিনিও ক্ষমতালোভী। স্বার্থসিদ্ধির জন্য রানি সত্যকে আড়াল করেছেন, দোষীকে শাস্তি না দিয়ে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন যা আদর্শ শাসকের কর্তব্য নয়।

তাছাড়া নাটকের অন্যান্য কিছু খল চরিত্র বার্তা-অধিকর্তা, পল্লিসেবক, বৈজ্ঞানিক, সৈন্যাধ্যক্ষ। নাটকে যাদের কোন নিজস্বতা নেই। তারা দুর্গশাসককে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। দুর্গশাসকের সাহায্য করতেই তারা খল চরিত্রে পরিণত হয়েছে। পল্লীসেবক সাঁকো মেরামতের জন্য অর্থ বেশি করে নিতে আর্জি জানিয়েছে। যাতে সেই অর্থ নিজে ভোগ করতে পারে। আবার জনগণ যখন নিজেদের প্রাপ্যের দাবিতে প্রতিবাদ করেছে, তখন পল্লীসেবক ভগবানের কাছে বন্যা বা ভূমিকম্পের প্রার্থনা করেছে। যাতে সেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় জনগণকে সর্বস্বান্ত করে এবং তারা বিদ্রোহ ভুলে রানির শরণাপন্ন হয়। শুধু তাই নয় বন্যা হলেই জনজীবন বিপর্যস্ত হবে। সেই পরিস্থিতিতে বাঁধ, সাঁকো প্রভৃতি বানানোর সুযোগ আসবে, আর তাতে লাভবান হবে পল্লীসেবক। অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের উপর আস্থা রেখে বসে না থেকে, বিজ্ঞানের সাহায্যে বন্যা এনে জনজীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে চেয়েছে। যাতে করে জনগণ ক্ষমতার কাছে মাথা নত করে। সংবাদপত্রের কর্তব্য মানুষের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া। জনগণের দাবিকে তুলে ধরে শাসক গোষ্ঠীকে সচকিত করা। কিন্তু তার জায়গায় বার্তা-অধিকর্তা বিপর্যস্ত জনগণের প্রতিবাদ থামাতে ভুল, মিথ্যা বার্তা পৌঁছাতে চেয়েছে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এভাবেই খল চরিত্রগুলি এঁকেছেন লেখক।

গল্পটি তিনি লিখছেন ১৯৭০-এর দশকে। সময়টা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের ইতিহাসে এক চরম নৈরাজ্য, অস্থিরতা এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কাল। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' নাটকটি এই সময়ের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নাটকটির প্রতিটি ছত্রে মিশে আছে। ষাটের দশকের শেষে শুরু হওয়া নকশালবাড়ি আন্দোলন, সত্তর দশকের শুরুতে এক চরম আকার ধারণ করে। মেধাবী তরুণ প্রজন্মের রাষ্ট্রবিরোধী বিদ্রোহ এবং তার বিপরীতে রাষ্ট্রের ভয়াবহ দমননীতি সমাজকে এক গভীর অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছিল। 'সিংহাসন' বা ক্ষমতাকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র যে কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে, সেই রূঢ় বাস্তবই এই নাটকের খল চরিত্রের মনস্তত্ত্ব গঠনে সহায়তা করেছে বলেই মনে হয়। তাছাড়া ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লড়াই, বিরোধী কণ্ঠরোধ এবং প্রশাসনিক স্তরে দুর্নীতির যে ব্যাপকতা দেখা গিয়েছিল, মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাকেই 'ক্ষয়রোগ' বা মরণব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নাটকের রাজা বা শাসক চরিত্রগুলোর মধ্যে যে অসংলগ্নতা এবং ভয় দেখা যাচ্ছে, তা আসলে তৎকালীন শাসকদলের ক্ষমতা হারানোর আতঙ্কেরই প্রতিফলন।

পরিশেষে বলা যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' নাটকের খল চরিত্রগুলো কেবল অশুভ শক্তির প্রতীক নয়, বরং তারা একটি ক্ষয়িষ্ণু শাসনব্যবস্থার অনিবার্য পরিণাম। এই নাটকে 'খলত্ব' কোনো ব্যক্তিগত বিচ্যুতি নয়, বরং তা একটি কাঠামোগত ব্যাধি। রাজা থেকে শুরু করে অমাত্যবর্গের প্রতিটি

স্তরে— বৈজ্ঞানিক, বার্তা-অধিকর্তা, সৈন্যাধ্যক্ষ ও পল্লীসেবকের যে নৈতিক পতন আমরা লক্ষ্য করি, তা আসলে ক্ষমতার সেই 'ক্ষয়রোগ' যা মানুষের বিবেককে কুরে কুরে খায়।

এই নাটকের খল চরিত্ররা জনকল্যাণের মুখোশ পরে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে মত্ত। তারা ভয়কে পণ্য করে, বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ করে এবং সংবাদমাধ্যমকে মিথ্যার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে কেবল একটি লক্ষ্যেই— সিংহাসন বা ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করা। চিত্রকর যখন এই অমাত্যদেরই অবয়ব দিয়ে এক ভয়ংকর দানবের ছবি আঁকেন, তখন নাট্যকার মূলত এই সত্যটিই প্রতিষ্ঠিত করেন যে, শোষক শ্রেণির সম্মিলিত রূপই হলো প্রকৃত দানব, যা সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় সত্তর দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতাকে রূপকের মাধ্যমে তুলে ধরলেও, এই নাটকের খল চরিত্রগুলোর প্রাসঙ্গিকতা আজও ফুরিয়ে যায়নি। ক্ষমতা যখনই জনবিচ্ছিন্ন হয় এবং শাসকেরা যখনই নিজেদের গদি বাঁচাতে সাধারণ মানুষের ওপর কাল্পনিক ভয় ও শোষণের জাল বিস্তার করে, তখনই 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। তখনই জনগণ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তাই এই নাটকের খল চরিত্ররা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের নয়, বরং তারা সর্বকালের স্বৈরাচারী ও সুবিধাবাদী মানসিকতার এক জীবন্ত দলিল। শোষিত জনতার জাগ্রত হওয়ার মধ্য দিয়েই এই ক্ষয়রোগাক্রান্ত ব্যবস্থার অবসান ঘটে— নাট্যকার এই আশাবাদ ব্যক্ত করেই ক্ষমতার দম্ভকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তাই সমাজের একজন দায়বদ্ধ লেখক হিসাবে নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় যে জীবন্ত দলিলের ছবি এঁকেছেন তা আজকের দিনেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। দাস, তপনজ্যোতি (সম্পা.)। রঙ্গপট নাট্যপত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা। ২০১২, কলকাতা, পৃ. ৬৭।
২। চট্টোপাধ্যায়, মোহিত। নাটক সমগ্র (প্রথম খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২৩৯।
৩। তদেব, পৃ. ২৪০।
৪। তদেব, পৃ. ২৪১।
৫। তদেব, পৃ. ২৪১।
৬। তদেব, পৃ. ২৪৫।
৭। তদেব, পৃ. ২৪২।
৮। তদেব, পৃ. ২৪২।
৯। তদেব, পৃ. ২৪৮।
১০। তদেব, পৃ. ২৫৮।
১১। তদেব, পৃ. ২৭০।
১২। তদেব, পৃ. ২৭৪।